হেনারা সবাই মুক্তিযোদ্ধা

কাইউম পারভেজ

দাওয়ায় বসে রক্তিম আকাশের দিকে চেয়ে আছে হেনা। আকাশটা এ সময়ে নীল হবার কথা। কিন্তু কেমন যেন লাল, রক্তিম। চোখে ছানি পড়েছে ডাক্তার বলেছে। চোখের মণির উপর একটা সাদা ফ্যাকাশে পর্দা পড়েছে। তাই মাঝে মাঝে ঝাপসা দেখে। সে কারণেই কী নীলাকাশ রক্তিম ঠেকছে? এ হেমন্ত সন্ধ্যায় গোধূলী হয়তো বা লাল রঙ্গের সাজ নিয়েছে। লাল রঙ্গের সাজ একদিন হেনাও নিয়েছিলো। উনিশ বছর বয়স তখন। বউ হয়ে যখন সুজনদের ঘরে এসেছিলো - এখনো মনে আছে সবাই বলেছিলো বাহ্ আমারগের সুজনের বউডা বিজায় সুন্দর হইয়েছে। এ্যাক্‌কেবারে লাল টুকটুকে বউ। বাসর ঘরে হেনার নত মুখের ঘোমটা তুলে সুজন বলে - এ্যাই তুমি নাকি বিজায় সুন্দর হইয়েছো কই দেখি দেখি! হেনা লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে বলে- যাও ফাজিল কনেকার। মেয়েছেলের গায়ে হাত দিতি তুমার লজ্জা করতিছে না?

মেয়েছেলের গায়ে হাত দিতি তুমার লজ্জা করতিছে না? কথাটা আরেকবার বলেছিলো হেনা বছর দুই পর স্বাধীনের যুদ্ধের সময়। উহহুরে - কেন সেই পূরণ কথা আবার মনের মধ্যি জাগতিছে? আমি এ সব কথা আর মনে করতে চাইনে। পঁয়তাল্লিশ বছর ধরেই মনে করতিছি আর ভুইলে যাবার চিষ্টা করতিছি। পুড়া মনরে - সব মইরে গেলিও তোর মরণ নেই। আমারে কষ্ট না দিতি পারলি তোর বিজায় কষ্ট হয় তাই না?

দেখি না তুমারে কেমন সুন্দর লাগতিছে। এই ফাজলামু কইরে না আমার বড্ড লজ্জা লাগতিছে কলাম। সুজন আর কোন শব্দ না করে টেনে বুকের মধ্যে নিয়েছিলো হেনাকে। পঁয়তাল্লিশ বছর পরও এতো ঝড় ঝাপটা অত্যাচার নির্যাতনের পরও হেনা সেই রাতের কথা - ওর বাসরের কথা ভুলতে পারে না। কী করে ভোলে মাত্র দু'বছরের স্মৃতি স্বামীর সঙ্গে। ইংরেজী উনসত্তর সালে ওর বিয়ে হলো। একাত্তরে যুদ্ধে চলে গেলো। সঙ্গে ওর চাচাতো ফুপাতো ভাইসহ গ্রামের আরো দশ বারোজন। যশোরের ঝিকরগাছা থেকে বেনাপোল সীমান্ত বেশী দূরের নয়। সেকথাই বার বার করে সুজন বুঝিয়েছে হেনাকে। এই তুমি কানতিছো কিসের জন্যি। এহেন থিকি বর্ডার কত্তদূর হ্যাঁ। বুড়িরচু খেলার মত চু-উ-উ-উ করে দোড় দিলি পারে বেনাপোল আর বনগাঁ। আবার কাবাডি কাবাডি কাবাডি করতি করতি ওহেন থেইকে আমাগের বাড়ি। পাগল - আমি তো যাওয়া আসার মধ্যি থাকপো।

বুড়িরচু আর কবাডির মত দৌড় দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ঘন ঘন বাড়িতে না এলেও নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছে হেনার সাথে। কেবল শেষের দিকে অর্থাৎ অক্টোবরের পর থেকে আর হেনার খবর পায়নি সুজন। সঠিক খবরটা ওকে কেউ দিতে পারেনি। সে সময়ে মুক্তিবাহিনীর চূড়ান্ত এবং বেপরোয়া আক্রমণে সবাই গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে। ওদিকে পাক সেনারাও মরিয়া হয়ে এলোপাথাড়ি আক্রমণ চালাচ্ছে শহর বন্দর গ্রামে। আলবদর রাজাকার গুলো পাগলা কুত্তার মত একে মারছে ওকে ধরছে আর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। কুত্তাগুলো জানেনা ওদের কি হবে। দেশ স্বাধীন হলে ওদের পাকি বাবারা ওদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে না কী মুক্তিবাহিনীর হাতে খতম হতে হবে? তাই ওরা বেপরোয়া। সুজন শুনেছে হেনারা গ্রাম ছেড়ে আরো ভিতরের দিকে ওদের বড়দাদা অর্থাৎ ওর দাদার বড় ভাইয়ের গ্রাম চৌগাছায় চলে গেছে। আবার কেউ বলছে বাড়ীর সবাই চৌগাছায় গেলেও হেনা যায়নি। হেনাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কোন একবার রাতের আঁধারে যখন কয়েক ঘন্টার জন্য বাড়ীতে এসেছিলো সুজন তখন হেনা বলছিলো - আমিও তুমার সাথে যুদ্ধ করবো। তুমি আমারে একটু টেরনিং দিবা দেখবা আমি ঠিকই পারবো। তুমি যদি না

নাও দেখবা আমি একদিন নুকোয়ে নুকোয়ে তুমার কাছে হাজির হইয়ে যাবানে। আমি গিরামের মাইয়ে। বন বাদার পেরোয়ে ঠিকই বর্ডার পার হয়ে তুমারে ধইরে ফ্যালবো।

সুজনকে হেনা ধরতে না পারলেও হেনাকে ধরে ফেলেছিলো রাজাকার গুলো। যেদিন ওরা চৌগাছা রওনা দেয় পথি মধ্যে রাজাকার গুলো রাতের আঁধারে ধরে ফেলে। সবাইকে ছেড়ে দিলেও হেনা আর পাশের বাড়ীর পনেরো বছরের বকুলকে ছাড়েনি। মুখ চোখ বেঁধে ওদের নিয়ে যায় ক্যাম্পে। চোখ বাঁধা অবস্থাতেই সারা রাত কেটেছে। সকাল বেলায় চোখ যখন খুললো তবুও চোখে যেন আঁধার। হেনা বুঝে নিয়েছে এ আঁধার বুঝি ওর পৃথিবী থেকে আর কোনদিন সরবে না। অনেক পর বুঝতে পারে ওর দুটো বাহু ধরে সামনে দাঁড়িয়ে ওদেরই পাশের গ্রামের মজনু। বহুদিনের পরিচিত মজনুকে দেখে প্রথম ভয় পেলেও পরে ভাবে মজনু হয়তো ওকে বাঁচাতে এসেছে। না পরক্ষণে বুঝেছে ও যা ভাবছে আসলে তা নয়। মজনুর চোখ, অভিব্যক্তি, আচরণ অন্য কথা বলছে। হঠাৎ বলে ওঠে- মজনু মেয়েছেলের গায়ে হাত দিতি তুমার লজ্জা করতিছে না? আমকে কেন ইখানে ধইরে এইনেছো? আমারে ছ্যাইড়ে দাও। তুমারে ছ্যাইরে দিবার জন্যি তো এখানে আনিনি। তবে? তবে তুমি কী কতি চাও? মেলা দিন ধইরে তুমারে চাইছি, তুমার পিছনে ঘুরিছি তুমি মোটেও আমারে পাত্তা দাওনি। সুজনই তুমার পছন্দের লোক হইয়ে গেল হ্যাঁ? সেই জন্যি কি তুমি রাজাকারের খাতায় নাম লিখোয়েছো? ঠাশ করে একটা থাপ্পর দিয়ে মজনু বলে - বল হারামজাদি তোর নাঙ সুজন কনে? খবরদার মজনু গায়ে হাত দিবিনে কলাম সুজন আমার নাঙ না আমার স্বামী। হেনার মাথার চুল চেপে ধরে টানতে টানতে মজনু বলে আয় হারামজাদি এবার তোর হতি পারতো স্বামীরে দ্যাখ।

সংজ্ঞা ফিরলে হেনা নিজেকে দেখলো সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। সারা গায়ে আঘাতের দাগ। মাদুরটাতে রক্তের লাল। ঠিক আজকের আকাশটার মত। এখন রাত না দিন হেনা বুঝতে পারে না। একটু পানির পিপাসায় ওর প্রাণ ওষ্ঠাগত। পাশের ঘরে আরো কয়েকজনের গলা পেলো। ওরা হাসাহাসি করছে আর গল্প করছে কে কীভাবে ওর শরীরটার ব্যবচ্ছেদ করেছে । হেনা আর শুনতে পারছে না। ছিঃ। না... বলে এক চিৎকার। চিৎকার শুনে মজনু ঘরে এলো। কিরে হারামজাদি তোর কি খুব কষ্ট হচ্ছে? কোন রকমে হাত পা দিয়ে আড়ষ্ট করে বস্ত্রহীন শরীরটা ঢাকতে চেষ্টা করেতে করতে হেনা বললো - মজনু তোর দুডো পায়ে পড়ি আগে আমার কাপড়ডা দে। তোর সব শখ তো মিটোয়ে ফেলেছিস এবারে আমারে যাতি দে। আর একটু পানি দে।

তুমি যাবা কনে হেনা সুন্দরী। তুমাগের বাড়ীর সবাই তো পলায়ে গেছে। তুই কি মনে করেছিস আমি তোর কাছে থাকপো? তার আগে আমি বিষ খেয়ে মরবো। আমার তো আর তোরে দিবার কিছু নেই তবু তুই যা চাস আমি চিষ্টা করবো তোরে দিতি। তুই আমারে মাফ কইরে দে আমারে ছাইড়ে দে। জোর করে শরীর পাওয়া যায়রে মজনু মন পাওয়া যায়না। তোর পায়ে পড়ি তুই আমারে ছাইড়ে দে। বেশ খালি খবরডা দে সুজন এখন কনে? যদি না বলিস আজ রাত্তিরে তোরে এমন জায়গায় পাঠাবো তোর বাপ আইসে বইলে যাবেনে সুজন কনে।

মজনু তার কথাা রেখেছে। পরদিন হেনাকে পাঠিয়ে দিয়েছে যশোর ক্যান্টনমেন্টে। একদিন টয়লেটের আয়নায় নিজেকে দেখে চমকে উঠেছে। এই কী সেই সুন্দরী হেনা? সারা মুখে খালি জানোয়ারের দাঁতের চিহ্ন। শরীরের দিকে তাকাতে পারে না। কেবল বেয়োনেটের খোঁচা। শরীরে পচনও ধরেছে। সৃষ্টিকর্তা কাছে তার প্রার্থণা আমি জানি আমার এ প্রার্থণার কোন মানে নেই তবু বলি তুমি দুনিয়াতে আর কোন মেয়ে মানুষ পাঠায়ও না। মেয়ে হয়ে জন্মানোডাই আমার জন্যি সবচে’ বড় পাপ। তুমি আমারে মাফ কইরে দিও। তুমি সবই দেখো সবই জানো সবই বোঝো। অদ্ভূত এই মাইয়ে মানুষের জানডা। এত কিছুর পরও বাইচে আছি। যমেরও কী চোখ পড়ে না ইদিকে।

ছয় ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী আর মুক্তিবাহিনী যশোর মুক্ত করলো। সুজন বাড়ীতে ছুটলো। কেউ নেই। এর ওর কাছে খুঁজতে খুঁজতে জানলো হেনা যশোর ক্যান্টনমেন্টে। ছুটলো। যশোর শহরে পোঁছে জানলো সব হেনাদের

জড়ো করা হয়েছে অস্থায়ী পূনর্বাসন কেন্দ্রে। একদিন হেনা শুনছে কেন্দ্রের লোকজন আলাপ আলোচনা করছে যেসব হেনাদের কোন আত্মীয় স্বজন আসেনি বা কোন ঠিকানা নেই তাদের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পিতার নাম লিখতে বলা হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমান আর ঠিকানা ৩২ নম্বর ধানমন্ডি, ঢাকা। হেনারা এও জেনেছে ওদের সন্মানিত করে সমাজে প্রতিষ্ঠার পাবার জন্য ওদের নাম হয়েছে বীরাঙ্গনা। বঙ্গবন্ধুই এ উপাধি ওদের দিয়েছিলেন। ওরা প্রথম প্রথম একটু স্বস্তি বোধ করেছে। হয়তো মানুষ ওদেরকে আলাদা করে দেখবে না। ও-ও তো মুক্তিযোদ্ধা। একটা নারী যখন তার সর্বস্ব দিয়ে দেয় দেশের জন্য তখন সে মুক্তিযোদ্ধা তো বটেই। কিন্তু না, কেউ সে কথা বলে না। কাগজে কলমে অনেক কিছু বলা হলেও ওদের জন্য কিছুই করেনি কেউ। এই এ বছরই পরধানমন্ত্রী (প্রধানমন্ত্রী) শেখ হাসিনা ওদের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমান ভাতার ব্যবস্থা করেছেন। তবু হেনার আক্ষেপ ওদেরকে বীরাঙ্গনা না বলে মুক্তিযোদ্ধা বলা হোক । মুক্তিযোদ্ধার সন্মান দেয়া হোক। বাঁচবেই বা আর ক'দিন। তবু মরার আগে জেনে যাক ওরা অচ্ছুত নয়। ওরা সমাজের অংশ। স্বাধীনতা অর্জনে ওদের অবদান খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই। ওরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা।

আজ ১৬ ডিসেম্বর। এ দিনটা এলেই হেনার মনটা খারাপ হয়ে যায়। বিজয়ে সবার আনন্দে থাকলেও হেনা চেষ্টা করেও আনন্দিত হতে পারে না। ওর খুব কষ্ট। সেই আশ্রয় কেন্দ্র থেকে নানা ঘাটের পানি খেয়ে এখন মণিরামপুরের এক প্রাইমারী স্কুলে ও আয়ার কাজ করে। সেটাও হয়েছে স্থানীয় এক মুক্তিযোদ্ধা কলিম ভাইয়ের সহযোগিতায়। যুদ্ধের ময়দানে সুজনের সাথী। তাঁর কাছেই হেনা জেনেছে যেদিন সুজন নিশ্চিত হয়েছে হেনার অদৃষ্টের কাহিনী সেটা সে সহ্য করতে পারে নি। নিজের বুকেই স্টেনটা চেপে ধরে চিরদিনের জন্য এ জ্বালা অপমান আর যন্ত্রনা শেষ করে দিলো। হেনা বলে তুমি বীর তবে কাপুরুষ বীর। একটাবার অন্তত দেইখে যাইতে তুমার সুন্দরী হেনা কেমন সুন্দর হইয়েছে। তুমার হেনা তুমার সাথে যুদ্ধে যাতি চাইয়েছিলো তুমি নাওনি। যুদ্ধে কিন্তুক আমিও ছিলাম। তবে তুমি হইয়েছো মুক্তিযোদ্ধা আর আমি বীরাঙ্গনা(!)।

হেনা এখনো চেয়ে আছে সেই রক্তিম আকাশটার দিকে। কলিমভাইয়ের ডাকে সম্বিত ফিরে পেল। বুইজলে হেনা, ভাইবে ছিলাম এই বিজয় দিবসের আগে আগে ধর চৌদ্দ পনেরো তারিখে মইত্যা রাজাকারডারে ঝুলোয়ে দেবে তা হইলে না। তবু আনন্দ সাকা মুজাহিদ তো ঝুইলেছে। শোনেন কলিম ভাই আপনি তো রাজনীতির লোক। ওই শেখ হাসিনারে একটু কবেন শুধু এই মাথা গুলোরে ঝুলোওয়ে যেন থাইমে না যায় মজনুরা যেন কোনমতে বাদ না পড়ে।। যেদিন মজনুরা ঝোলবে সেদিন আমার বিজয়।

আর একটা কথা ওই পরধান মন্ত্রীরে একটু কবেন আমাগের আরেকটা দয়া কত্তি। আমাগেরে যেন আর বীরাঙ্গনা না বলা হয়। আমরা মুক্তিযোদ্ধা। বীরঙ্গনা বলে আঙ্গুল তুইলে আমাগের ইঙ্গিত করলেই তো সমাজকে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়ে দেয়া আমরা কারা। আর সমাজ তখন ভাবে আমরা অচ্ছুত। কানারে কানা আর খুঁড়ারে খুঁড়া বলা তো অন্যায়, তাই না?